স্বামী বিবেকানন্দের

"চিকাগো" বক্তৃতা।

প্রথম সংস্করণ।

১০০০ কাপী। ১ ফাল্গুন, সন ১৩০৮ সাল।

কলিকাতা।

উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক উদ্বোধন-যন্ত্রালয় হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

 মূল্য আট আনা।

মুখবন্ধ।

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী পাশ্চাত্য সভ্য জাতিদের মধ্যে আজ কাল যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, সেই স্রোতকে আশ্রয় করিয়া অনেক বিজাতীয় নর নারী সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে যত্নবান্ হইতেছেন। যাঁহারা কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দু সন্তানকে অসভ্য বর্ব্বরজাতিপ্রসূত বলিয়া ঘৃণা করিতেন, যাঁহারা কৃষ্ণকায় বাঙ্গালীকে মিথ্যাভাষণের মূর্ত্তি বলিয়া চিরকাল ধারণা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই আজ কাল বিপরীত মত আশ্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দুরা যে পৌত্তলিক এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম যে পুত্তলিকার ন্যায় নির্জীব ও অসার, এই ভাব অনেকেরই মন হইতে তিরোহিত হইতেছে। বিবেকানন্দের সুমার্জ্জিত ধীশক্তি, অদ্ভুত মেধা, অপরিসীম বাক্যকৌশল, ও অভাবনীয় ত্যাগই যে এই মত পরিবর্ত্তনের অদ্বিতীয় কারণ ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী চিকাগো নগরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সপ্তদশ দিবস ধরিয়া যে সর্ব্বধর্ম্ম-মহাসমিতির অধিবেশন হয়, সেই অভূতপূর্ব্ব অধিবেশনের সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধি মুখে স্ব স্ব মত যথাযথ বিবৃত করিয়াছিলেন। এই সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রায় সমুদায় ধর্ম্মের প্রধান ও খ্যাতনামা মহাত্মাদিগকে পাথেয় দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মই নিজ নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল; কিন্তু হায়! সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এই সভায় প্রতিনিধি স্বরূপ কাহাকেও পাঠাইতে পারেন নাই।

মান্দ্রাজ অঞ্চলবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্তশালী যুবক বিবেকানন্দের উদারতা, ত্যাগ, নিরতিশয় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ ধীশক্তি, বাগ্মিতা প্রভৃতি বহুবিধ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উক্ত মহাসভায় প্রেরণ করিতে সমুৎসুক হয়েন। তাঁহারা বহু আয়াস ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া তদীয় পাথেয়ের জন্য অর্থ সঙ্কলন করতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপ করিয়া তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন।

সমুদয় পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সভ্যজাতিগণ এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এই মহাসভায় খৃষ্টধর্ম্মেরই জয় পতাকা সর্ব্বোপরি উড্ডীন হইবে এবং অন্যান্য ধর্ম্মের অসারতা চিরকালের জন্য প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। হিন্দু-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে অন্তঃসার-শূন্য ইহা তাঁহারা এক প্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায় অনুধাবন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কে জানিত যে, ত্রিংশদ্বর্ষীয়, কপর্দ্দক শূন্য, ভিক্ষাজীবী এক যুবা-পরিব্রাজক এই পরাধীন, পদদলিত, ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হিন্দুজাতির উপেক্ষিত সনাতন ধর্ম্মকে সর্ব্বধর্ম্মের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে? কে জানিত যে, এক জন সামান্য বঙ্গীয় যুবক, সমুদয় পাশ্চাত্য সভ্যজাতির হৃদয় হইতে হিন্দুধর্ম্মের উপর বহুবর্ষব্যাপী বদ্ধমূল ঘৃণারভাব, একটি মাত্র বক্তৃতা দ্বারাই, তিরোহিত করিতে সমর্থ হইবে? কে জানিত যে, সভ্যজাতীয় অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ যশস্বী মনীষীগণ, জগতের মধ্যে সাতিশয় 'ভীরু ও হেয়' জাতি প্রসূত জনৈক স্বল্প বয়স্ক যুবকের নিকট তর্ক ও যুক্তিতে পরাজয় লাভ করিবেন? কে জানিত যে, এই হীনপ্রভ, পরাধীন মুমূর্ষু প্রায় হিন্দুজাতির মধ্যে এক অমূল্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরত্ন বিস্মৃতির অন্ধকারে উপেক্ষাধুলি সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে, এবং একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেই রত্নের উদ্ধার সাধন করিয়া তদীয় জ্যোতিঃপুঞ্জে সমুদয় সভ্যজাতির চক্ষু ঝলসিয়া দিবে? এ দুষ্পূরণীয় আশা কেহই হৃদয়ে পোষণ করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু বিধানানুসারে সে আশাও ফলবতী হইল এবং সে সকল দুষ্কর কার্য্যও সুসম্পন্ন হইল।

এই বিবেকানন্দ যে বিধাতার বলে বলীয়ান্ হইয়া এই অসম্ভব কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, সেই বল কোন্ মহাপুরুষের ভিতর দিয়া তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল? বিবেকানন্দ কাঁহার অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া আজ জগন্মান্য হইয়াছেন? যাঁহার জন্মমহোৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসর বসন্তাগমে, কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থ বেলুড়-মঠপ্রাসাদের সুবিশাল ময়দানে, সহস্র সহস্র নর নারীর সমাগম হয়; যাঁহার অতি ঋজু, বালবোধ্য উপদেশাবলি বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ন্যায়, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতির জটীল প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা অতি

সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়, যাঁহার নিরক্ষরতার সহিত সুগভীর সহজ জ্ঞান-রাশি ভাগ্যবান্ দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলির যুগপৎ বিস্ময় ও পরমানন্দ উৎপাদন করিত; যিনি লিখন পঠনে অনভিজ্ঞ হইলেও, বঙ্গের কুলদেবতাস্বরূপ পণ্ডিত-প্রবর দানবীর করুণাসমুদ্র মহাত্মা বিদ্যাসাগরের, ও বাগ্মিবর পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মধর্ম্মনেতা কেশবচন্দ্রের নিরতিশয় সম্মানভাজন ও পূজনীয় হইয়াছিলেন; যাঁহার দর্শন ও স্পর্শনে কত কত বঙ্গীয় যুবকের হৃদয়, ধর্ম্মের পবিত্র আলোকে, উদ্ভাসিত হইয়াছে; সেই পূজ্যপাদ প্রেমরস-পরিপ্লুত, জ্ঞান-গম্ভীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবই এই মহৎ কর্ম্ম সাধনের মূল কারণ। শ্রীমদ্বিবেকানন্দ তাঁহার নিরতিশয় প্রিয়পাত্র ও অতি আদরের জিনিষ। বিবেকানন্দ তাঁহার বলেই বলীয়ান্ বলিয়া এই অসম্ভব কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যে বক্তৃতাটি হিন্দুধর্ম্মের অদৃষ্ট ফিরাইয়া দিয়াছে, অনেক ইংরাজী ভাষান-ভিজ্ঞের তদ্বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিতে পারে। সেই কৌতূহল নিবারণার্থই আমি উক্ত বক্তৃতাটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অনুবাদে, মূলের ওজস্বিতা, মাধুর্য্য, বাক্য ও বর্ণবিন্যাসের পারি-পাট্য প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই লাঘব ও হানি হইয়া পড়ে, বক্তার যথাযথ ভাব-গুলি অনুবাদে ততদূর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। আমি যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটি করি নাই। এতদ্দ্বারা কাহারও কৌতুহল কথঞ্চিৎ পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ইতি
বিনয়াবনতস্য—
অনুবাদকস্য।

 চিকাগো-ধর্ম্মসভায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপর

স্বামী বিবেকানন্দের সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা।

(১১ই সেপ্টেম্বর, ইং ১৮৯৩ খ্রীঃ।)

ধর্ম্মসভার প্রথম দিবসের অধিবেশন।

"কার্ডিন্যাল্ গিবন্সের উভয় পার্শ্বে পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চলীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধিগণ উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নানাবর্ণের বেশ, উজ্জলতায়, কার্ডিন্যাল সাহেবের বেশের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ হইয়াছিল। হিন্দু, বুদ্ধ ও মহম্মদ মতাবলম্বীদের মধ্যে, বাগ্মীপ্রবর ভারতবর্ষীয় বিবেকানন্দস্বামী, গৈরিকবর্ণের বেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর্শনীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার শিরোভাগ বৃহদায়তনের পীতবর্ণ উষ্ণীষে মণ্ডিত হইয়া তদীয় মুখলাবণ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল।"

"অন্যান্য বাগ্মিগণের বক্তৃতা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীমদ্‌বিবেকানন্দ স্বামীকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইল। স্বামী বিবেকানন্দের এমনই একটী আশ্চর্য্য গুরুদত্ত ঐশ্বরিক আকর্ষণী এবং মনোমুগ্ধকারী শক্তি ছিল যে, তিনি যেই শ্রোতৃগণকে—"আমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতৃগণ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অমনিই কিয়ৎকাল ধরিয়া সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। পরে তিনি নিম্নোক্ত অভ্যর্থনা-সূচক বাক্যে কিছু বলিলেন :—

অভ্যর্থনা।

হে আমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতৃ মণ্ডলি! অদ্য আমাদিগকে আপনারা হৃদয়ের সহিত যে প্রগাঢ় অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তৎপ্রতিদানের জন্য আমি আজ দণ্ডায়মান হইয়াছি, এবং কি বলিব—ইহাতে আজ আমার

হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে! পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী-সমাজের মুখ-স্বরূপ হইয়া, আজ আমি আপনাদিগকে সাধুবাদ দিতেছি। সর্ব্বধর্ম্মের প্রসূতি স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, তাহার প্রতিনিধি হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এবং কি বলিব!—পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দুজাতির ও যাবতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর মুখ-স্বরূপ হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

এই সভামঞ্চে কতিপয় সুবক্তা এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে অতি, দূরদেশ নিবাসী জাতি সকলের মধ্য হইতে যাঁহারা অদ্য এইখানে সমাগত হইয়াছেন তাঁহারাও যে সর্ব্বত্র সমদর্শনের ভাব ঘোষণা করিয়া মহিমান্বিত হইতে পারেন ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যাঁহারা এইরূপ বলিলেন, আমি তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। আমি বড়ই সমদর্শনের পক্ষপাতী। যে ধর্ম্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ব্ববিধ মত গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্ম্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখি তাহা নহে, সকল ধর্ম্মকেই আমরা সত্য বলিয়া অতিশয় বিশ্বাস করি। যে ধর্ম্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায়, ইংরাজী 'একস্‌ক্লুজন' (অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যজ্য) শব্দটী কোনও মতে অনুবাদিত হইতে পারে না, আমি—সেই ধর্ম্ম ভুক্ত। যে জাতি, পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম ও জাতিকে চিরকাল আশ্রয় দান করিয়া আসিয়াছেন; যে জাতি চিরকাল, যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত ও আশ্রয়লিপ্সু জনগণকে অকাতরে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, আমি—সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। যে বৎসর রোমকদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে ইহুদিজাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীকৃত হয়, সেই বৎসর তাহাদের কিয়দংশ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয়লাভার্থ আসিলে এই অস্মজ্জাতীয়েরাই তাহাদিগকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন; আমি সেই জন্যও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। জোরোয়াস্তরের অনুগামী সুবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম্ম আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং আজও পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, আমি—সেই ধর্ম্মভুক্ত।

কোটি কোটি নরনারী যে স্তোত্রটী প্রতিদিন পাঠ করেন, এবং যাহা আমি অতি বাল্যাবস্থা হইতেই আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমি সেই শ্লোকার্দ্ধটি আজ আপনাদিগের নিকট বলি যথা,—"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথযুষাং। নৃণামেকোগম্য স্তমসি পয়সামর্ণবইব॥" অর্থাৎ—হে প্রভো! ভিন্ন ভিন্ন রুচি হেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথগামীদের, নদীগণের সাগর তুল্য, তুমিই এক মাত্র গম্য স্থান।

এই বর্ত্তমান সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহতী ধর্ম্মসমিতি অদ্ভুত গীতাপ্রচারিত মতেরই পোষকতা করিতেছে। সে মতটি এই—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃপার্থ সর্ব্বশঃ॥" অথাৎ যে যেরূপ মত আশ্রয় করিয়া আমুকূনা কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে মন্নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, ও ইহাদের ফলস্বরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছে। এই ধর্ম্মোন্মত্তা জগতে মহা উপদ্রবরাশী উৎপাদন করিয়াছে, কতবার ইহাকে নর-শোণিতে পঙ্কিল করিয়াছে; সভ্যতার নিধনসাধন করিয়াছে; ও যাবতীয় জাতিকে সময়ে সময়ে হতাশার সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে; এই ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত তাহা হইলে জগতে আজ আমরা ইহা অপেক্ষা কত উন্নতি দেখিতাম। কিন্তু, ইহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে; এবং আমি সর্ব্বতোভাবে ইহাই আশা করি যে, এই ধর্ম্মসমিতির সম্মানার্থ অদ্য যে ঘণ্টাধ্বনি চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল সেই ঘণ্টানিনাদই,ধর্ম্মোন্মত্ততা দ্বারা এবং তরবারি অথবা কুতর্কাদি দ্বারা উদ্ঘটিত বহুবিধ উৎপাত-পরম্পরার সমূলে নিধন-সমাচার ঘোষণা করিল। সকল ধর্ম্মাবলম্বী এক ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন; তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে হিংসা দ্বেষ সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি কুভাব সকল আছে, এই ঘণ্টা ধ্বনি আজ সেই সকলেরও প্রলয়-বার্ত্তা ঘোষণা করুক।

(পঞ্চম দিবসের অধিবেশন। ১৫ই সেপ্টেম্বর।)

ভ্রাতৃভাব।

[১৫ই সেপ্‌টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণে ধর্ম্মসমিতির পঞ্চম দিবসীয় অধিবেশনের সময় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদনের জন্য বাকবিতণ্ডায় নিযুক্ত হন। অবশেষে শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামী নিম্ন লিখিত উপাখ্যানটি বলিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দেন।]

আমি আপনাদিগকে একটী ক্ষুদ্র গল্প বলিঃ—ইতি পূর্ব্বে একজন সুবক্তা বলিলেন যে "এস আমরা পরস্পরের নিন্দাবাদ হইতে বিরত হই"; ইহা আপনারা সকলেই শুনিলেন। আমাদের ভিতর এরূপ মতভেদ হইতেছে দেখিয়া বক্তা মহাশয় বড়ই দুঃখিত। আমি একটী গল্প বলিব, আমার বোধ হয় তদ্দ্বারা এই মতভেদের কারণ কি তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

এক ভেক কোন একটি কূপে বাস করিত। সে বহুকাল তথায় বাস করে। যদিও সেই কূপেই তাহার জন্ম এবং সেই খানেই প্রতিপালিত, তথাপি তাহার আকার অতিশয় খর্ব্ব ছিল। সে সময় বর্ত্তমান কালের কোনও ক্রমবিকাশবাদী ছিলেন না বলিয়া, অন্ধকারময় কূপে চিরকাল বাস করিয়া ভেকটি দৃষ্টিশক্তি বিরহিত হইয়াছিল কি না সে বিষয় কেহই জ্ঞাপন করেন নাই। কিন্তু গল্পের সুবিধার জন্য আমরা অবশ্যই ভেকটিকে চক্ষুষ্মান বলিয়া স্বীকার করিব। ভেক প্রতিদিন এরূপ উৎসাহের সহিত কূপ-মধ্যস্থ যাবতীয় কীটগুলিকে কবলিত পূর্ব্বক তাহার জলকে পরিষ্কৃত রাখিত যে, সেরূপ উৎসাহ বর্ত্তমান কালের কীটানুতত্ত্বলিপ্সু পণ্ডিতগণেরও শ্লাঘার বিষয়। সে এইরূপে ক্রমে ক্রমে কিছু স্থূল দেহ হইয়া উঠিল। একদা ঘটনা ক্রমে সমুদ্রতীরবাসী কোন একটি ভেক আসিয়া সেই কূপে পতিত হইল।

কূপ-মণ্ডুক জিজ্ঞাসিল "তুমি কোথা হইতে আসিলে?" সে উত্তর করিল "আমি সমুদ্র হইতে আসিতেছি।"

সমুদ্র? সে কত বড়? তাহা কি আমার কূপের মত বড়?" ইহা বলিয়া কূপ-মণ্ডুক কূপের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লাফাইয়া পড়িল।

তাহাতে সাগরবাসী ভেক কহিল "ওহে ভাই তুমি এই ক্ষুদ্র কূপের সহিত সমুদ্রের তুলনা কিরূপে করিলে?" ইহা শুনিয়া কূপ-মণ্ডুক আর একবার লাফাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে "তোমার সমুদ্র কি এত বড়?"

"সমুদ্রের সহিত কূপের তুলনা করিয়া তুমি কি মূর্খের ন্যায় প্রলাপ করিতেছ?"

ইহাতে কূপ-মণ্ডুক কহিল "আমার কূপের ন্যায় কিছুই বড় হইতে পারে না, ইহাপেক্ষা কিছুই বড় থাকিতে পারে না, এ লোকটা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী; ইহাকে তাড়াইয়া দাও।"

হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু; আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি ও ইহাকেই সমগ্রজগৎ বলিয়া মনে করিতেছি। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন ও তাহাকেই সমগ্র জগৎ বোধ করিতেছেন। মুসলমানও আপনার ক্ষুদ্র কূপে উপবিষ্ট আছেন ও তাহাকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন। হে আমেরিকাবাসীগণ আপনারা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎগুলির অবরোধ ভাঙ্গিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিই। আশা করি ঈশ্বর ভবিষ্যতে আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর। নবম দিবসের অধিবেশন।

হিন্দুধর্ম্ম।

ইতিবৃত্ত যে সময়ের বৃত্তান্ত ঘুণাক্ষরে জানিতেও অক্ষম, সেই সুপ্রাচীন সময়ে হিন্দু, পারসীক, ও ইহুদী এই তিন জাতির ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ইহারা প্রত্যেকেই মহা মহা বিপত্তি পরম্পরা সহ্য করিয়া আসিয়াছে ও ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া আজ পর্য্যন্তও নিজেদের আভ্যন্তরিক মহাশক্তির পরিচয় দিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইহুদী-ধর্ম্ম স্বপ্রসূত খ্রীষ্টধর্ম্মকে আপ-

নার আয়ত্বাধীন করা দূরে থাকুক, আপনিই স্বায় বিজয়োন্মত্ত সন্ততি কর্ত্তৃক আপনার জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে ; এবং অতি অল্প সংখ্যক পারসীক মাত্র এক্ষণে তাহাদের মহান্ ধর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উঠিল, এক এক সময়ে এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া যায়, কিন্তু যেমন মহাভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া, পরে পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ প্রচণ্ড প্রতাপে সম্মুখস্থ সমুদয় পদার্থকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সেইরূপ বেদোক্ত ধর্ম্মও প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া পরিশেষে সেই সেই সম্প্রদায় গুলিকে সর্ব্বতোভাবে কবলিত করতঃ আপনার বিরাট দেহের পুষ্টি সাধন করিয়াছে।

বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানশাস্ত্র যে বেদান্তের মহোচ্চ ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র,—সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, এবং জৈনদের নিরীশ্বরবাদ হইতে সামান্য মূর্ত্তিপূজা, ও সুবচনির কথার মত নানাবিধ উপকথা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই স্থান হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিশেষরূপে আছে।

এক্ষণে এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন, ও আপাত দৃষ্টিতে বিরোধী ভাবসমুদায়ের সাধারণ ভিত্তিমূল কোথায় ? কোন্ সাধারণ কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া ইহারা অবস্থান করিতেছে ? আমি এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে অদ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

হিন্দুগণ, আপ্তবাক্য-বেদ হইতে, নিজেদের ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদ সমুদয়কে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে তাহা শ্রোতৃমণ্ডলির হাস্যের বিষয় হইতে পারে বটে, কিন্তু "বেদ" এই শব্দদ্বারা কোনও পুস্তক বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সমুদয় আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, বেদ সকল তৎসমুদয়ের ভাণ্ডার স্বরূপ। যেমন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল, এবং সমুদয় মনুষ্য ভুলিয়া গেলেও যেমন সে সকল বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলিও তদ্রূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে সকল পবিত্র ও সাধু সম্বন্ধ, সর্ব্বজনপিতা ঈশ্বরের সহিত মানবের যে সমুদয় দিব্য ও বিশুদ্ধ সম্বন্ধ, তৎসমুদয়

আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও ছিল এবং যদি সকলে তদ্বিষয় বিস্মৃত হয়েন তাহা হইলেও থাকিবে।

এই সমুদয় আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম "ঋষি"। আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিষয়ের পারদর্শী বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। শ্রোতৃগণকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে সেই সকল পরমঋষিদিগের মধ্যে কতিপয় স্ত্রীলোকেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

এ স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলি অনন্তকাল থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা নিশ্চয়ই এক সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহারা নশ্ব হইলেও কখনও অনাদি হইতে পারে না। বেদ বলেন যে সৃষ্টি (সুতরাং সৃষ্টির নিয়মাবলি) অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানশাস্ত্রও প্রমাণ করিয়াছে যে সৃষ্টীশক্তির সমষ্টি সর্ব্বকালেই সমান। তাহা হইলেও যদি বল, যে এমন এক সময় ছিল যখন কিছুই ছিল না। তবে জিজ্ঞাসা করি এই সকল শক্তি তখন কোথায় ছিল ? কেহ কেহ বলিবেন যে ঈশ্বরেই সে সমুদয় অন্তর্নিহিত ছিল। তাহা হইলে ঈশ্বর কখনও সক্রিয় এবং কখনও নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ তিনি বিকারশীল। কিন্তু যখন বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ বলিয়া পরিগণিত, এবং যখন মিশ্র পদার্থ মাত্রই বিনাশশীল তখন, ঈশ্বরও বিনাশশীল। ইহা কখনই হইতে পারে না। সুতরাং এমন এক সময় ছিল না, যখন কিছুই (অর্থাৎ সৃষ্টি) ছিল না। কাজেই সৃষ্টি অনাদি। যদি উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া দোষাবহ না হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা এই দুইকে দুইটী অনাদি ও অনন্ত সীমান্তর রেখার সহিত তুলনা করা যায়। ঈশ্বর নিত্য মহাশক্তি স্বরূপ সর্ব্ববিষয়ের বিধান কর্ত্তা, তিনি প্রলয় সাগর হইতে নিত্য কাল ব্রহ্মাণ্ড সমূহ সৃজন করিতেছেন, কিছুকাল পালন করিতেছেন, পুনরায় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। এইরূপ নিত্যকাল চলিতেছে। হিন্দুসন্তান গুরুর সহিত ইহাই প্রতিদিন পাঠ করিয়া থাকেন, যথা "সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।"

অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র সৃজন করিলেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রও ইহাই বলিতেছেন।

আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করি--আমি আমি আমি—তাহা হইলে আমার কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি,—এরূপ ভাবই মনে আসে। তাহা হইলে কি আমি জড়—না জড়ের সমষ্টিভূত দেহস্বরূপ? বেদ বলিতেছেন "না"। আমি দেহ মধ্যস্থ "আত্মা"—আমি দেহ নহি। দেহ নষ্ট হইবে কিন্তু আমি নষ্ট হইব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু যখন এই দেহ পঞ্চত্ব লাভ করিবে, আমি বিদ্যমান থাকিব; এবং, এই দেহগ্রহণের পূর্ব্বেও আমি ছিলাম। আত্মা কোন পদার্থ হইতে সৃষ্ট হয় নাই; কারণ, সৃষ্টি শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ। এবং সেই সংযোগ ভবিষ্যতে বিয়োগাধীন। অতএব আত্মা যদি সৃষ্ট হয় তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই বিনশ্বর। সুতরাং আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নয়। কেহ কেহ জন্মিয়া অবধি সুখভোগ করিতেছে। শরীর দিব্য সুস্থ ও সুন্দর, মন উৎসাহ পূর্ণ কিছুরই অভাব নাই। কেহ কেহ জন্মিয়া অবধি দুঃখভোগ করিতেছে, কাহারও হস্ত পদ নাই, কেহ কেহ বুদ্ধিবিরহিত এবং অতি কষ্টে জীবন-তরণী বহিয়া যাইতেছে। যখন তাহারা সকলেই এক ন্যায়বান ও দয়াময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইল, তখন কেহ সুখী ও কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান্ কেন এত পক্ষপাতী? যদি বল যে যাহারা এ জন্মে দুঃখ ভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহারা সুখভোগ করিবে; তাহাতে কি হইল? দয়াময় ও ন্যায়বানের রাজ্যে কেন একজন দুঃখভোগ করিবে? দ্বিতীয়তঃ এতদ্বারা কোন কারণ বিনির্ণীত হইল না। পরন্তু কোন এক সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা উল্লিখিত হইল। ইহা বিজ্ঞান সঙ্গত নহে। অতএব মনুষ্য সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্ব্বে অন্যান্য বহুবিধ কারণ ছিল যাহাতে সে সুখী বা দুঃখী হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহই সেই সমুদয়ের কারণ। মানবের দেহ ও মন পিতৃপিতামহাদির দেহ ও মনের সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে এরূপ বলিলে কি ইহার সমুচিত উত্তর হয় না? ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে জীবনস্রোত জড় ও চৈতন্য এই দুই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। যদি জড় ও জড়ের বিকার, আত্মা মন বুদ্ধি প্রভৃতির কার্য্য সংসাধিত করে, তাহা হইলে আর স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা

নাই। কিন্তু জড় হইতে যে চৈতন্য শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে ইহা কোন মতে প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং এক জড় পদার্থ হইতে সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে স্বীকার করিতে হইলে, এক মূল চৈতন্য হইতে সমুদয় সৃষ্টি-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে ইহা স্বীকার করাও অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত এবং এমন কি সকলের প্রার্থনীয়। কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই।

আমরা অবশ্যই কখন অস্বীকার করিতে পারি না যে, মানবদেহে পিতৃ-পিতামহাদির অনেক স্বভাব সংক্রামিত হয়, সেই স্বভাব সর্ব্বতোভাবে দৈহিক। যে আত্মা যাদৃশ স্বভাবাপন্ন সেই আত্মা ঠিক তাদৃশ দেহকেই আশ্রয় করিয়া তাহার স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু আত্মার তত্তৎস্বভাব কোন পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম জন্যই হইয়া থাকে। যে আত্মা যে বিষয়ে প্রবণ, সেই আত্মা "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" এই নিয়মানুসারে তদুপযোগী দেহে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন ইহা বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কারণ বিজ্ঞান শাস্ত্র বলেন যে, স্বভাব অভ্যাস হইতে হয়, এবং অভ্যাস পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সুতরাং, কোন নবজাত বালকের স্বভাব তাহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল। তাহার পক্ষে বর্ত্তমান জীবনে সেই স্বভাব লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং তাহা অবশ্যই পূর্ব্ব জীবন হইতে আসিয়াছে।

আচ্ছা স্বীকার করা গেল যে পূর্ব্ব জন্ম আছে। কিন্তু তাহা হইলে কেন পূর্ব্ব জীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে না? ইহা সহজেই বুঝান যাইতে পারে। আমি এক্ষণে ইংরাজীতে কথা বলিতেছি, ইহা আমার মাতৃভাষা নয়। বাস্তবিক এখন আমার মাতৃভাষার এক অক্ষরও মনে উঠিতেছে না। কিন্তু যদি আমি মনে করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে এখনই মনে উঠিবে। এই ব্যাপারে এরূপ বুঝা যাইতেছে যে মনঃসমুদ্রের উপরিভাগে যাহা থাকে তাহাই আমাদের বোধ গম্য হয় এবং আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানরাশি সেই সমুদ্রগর্ভে নিহিত থাকে। চেষ্টা করিলেই তাহাদিগকে উপরে আনা যাইতে পারে। এবং এমন কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানও মনে উঠিতে পারে। পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে ইহা সুন্দর প্রমাণ। বাক্যের সাফল্যই তাহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ এবং ঋষিগণ সমস্ত জগতে এই বাক্য ঘোষণা করিতেছেন "স্মৃতি সাগরের গভীরতম

প্রদেশ কিরূপে আলোড়িত করিতে হয় সেই গূঢ় বিষয় আমরা আবিষ্কৃত করিয়াছি।" তাঁহাদের অনুসরণ পুরঃসর সবিশেষ সাধনা কর তোমারও পূর্ব্বজন্মের কথা মনে করিতে পারিবে।

অতএব দেখা গেল হিন্দু আপনাকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না ও বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। সেই আত্মা এরূপ একটি বৃত্ত স্বরূপ যাহার পরিধি অনির্দ্দেশ্য, কিন্তু যাহার কেন্দ্র কোন একটি দেহ মধ্যে অবস্থিত এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। আত্মা জড়নিয়মের বশীভূত নহেন। ইনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। কিন্তু কোন অব্যক্ত কারণ বশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন ও আপনাকে জড় বলিয়া মনে করিতেছেন। কেন এই বিশুদ্ধ, পূর্ণ ও বিমুক্ত আত্মা জড়ের দাসত্ব করিতেছেন এবং পূর্ণ হইয়াও আপনাকে অপূর্ণের ন্যায় মনে করিতেছেন? কেহ কেহ মনে করেন যে হিন্দুগণ এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে পারিবেন না বলিয়া উহা একেবারে লোপ করিয়া দিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন পণ্ডিত আত্মা ও জীব এই দুইয়ের মধ্য প্রদেশে কতকগুলি পূর্ণকল্প সত্ত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করেন এবং তাহাদিগকে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক দীর্ঘাকার সংজ্ঞাদ্বারা আখ্যাত করেন। কিন্তু সংজ্ঞা দিলেই কি উহার কিছু মীমাংসা হইল? প্রশ্ন যেমন তেমনই রহিল। যিনি পূর্ণ তাঁহাতে কিরূপে পূর্ণতার অণুমাত্রও লাঘব সম্ভব; যিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব কিরূপে তাঁহার তৎস্বভাবের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম হয়; হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সত্যবাদী। তাঁহারা মিথ্যা তর্ক যুক্তিদ্বারা মীমাংসার চেষ্টা পান নাই বা মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া পাণ্ডিত্যন্মন্য হইতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে, ইহা অব্যক্ত। আমরা জানিনা যে কেমন করিয়া পূর্ণ আত্মা আপনাকে অপূর্ণ ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবেই সত্য; প্রত্যেকেই আপনাকে দেহস্বরূপ বলিয়া মনে করে। আত্মা এই দেহে যে কেন আসিয়াছেন এই বিচার করিবার চেষ্টা করি না।"

অতএব ইহা বুঝা গেল যে মনুষ্যের আত্মা অনাদি অমর ও পূর্ণ এবং দেহ

হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ; এবং ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কর্ম্মের ফলস্বরূপ। আত্মা, জন্ম ও মৃত্যু চক্রে, ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছেন। প্রচণ্ড বায়ুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার সফেন তরঙ্গের শীর্ষদেশ আশ্রয় করে এবং পরক্ষণেই যেমন তরঙ্গ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্ন দেশে গমন করে সেইরূপ আত্মাও সদসৎ কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া একবার ঊর্দ্ধগামী ও আবার অধোগামী হইতেছেন। নিত্য প্রবাহিত, প্রচণ্ড, ভীষণ ও গর্জ্জন শীল কার্য্য-কারণ স্রোতে দুর্ব্বল অসহায় আত্মা বিতাড়িত হইতেছেন। নিয়ত পরিভ্রমণশীল কর্ম্মচক্র একভাবেই বিঘূর্ণিত হইতেছে। পতিশোক বিধুরা বিধবার ক্রন্দন শুনিতেছে না, পিতৃমাতৃ বিয়োগ কাতর বালকের দিকেও চাহিতেছে না, সম্মুখে যাহা পাইতেছে, তাহাকেই পেষণ করিয়া ফেলিতেছে। আত্মা সেই ভীষণ কর্ম্মচক্রে একটি ক্ষুদ্র কাটের স্বরূপ থাকিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন।

ইহা ভাবিলে হৃদয় বিহ্বল হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই। ইহার কি কোন উপায় নাই? পারত্রাণের কি কোনও পথ নাই? মানব হতাশ হইয়া এইরূপে রোদন করিতে লাগিল। করুণানিধান বিশ্বপিতা তাহা শুনিলেন এবং এক বেদাবৎ ঋষির হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। ঐশী শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত মহর্ষি অমনি দণ্ডায়মান হইয়া জগতে ঘোষণা করিলেন "হে বিশ্ব পুরবাসি অমৃতের অধিকারিগণ, হে দিব্যলোকনিবাস ত্রিদশমণ্ডলি! তোমরা সকলে আসিয়া শুন আমি সেই অনাদি পুরাতন মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবে, আর অন্য পথ নাই।"

"অমৃতের অধিকারী" এই নামটি কেমন মধুর ও কি উল্লাসবর্দ্ধক! হে ভ্রাতৃগণ! এই মধুরনামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিব। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদের পাপী বলিতে অস্বীকার করেন।

তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ। তোমরাই এই মর্ত্ত্য ভূমির দেবতা। তোমরা পাপী? ইহা অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। বিশুদ্ধ মানবাত্মার ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ মাত্র।

হে ভ্রাতৃগণ! সিংহ স্বরূপ হইয়া আপনাদের মেষ তুল্য মনে করিতেছ কেন? তোমরা জরামরণরহিত মুক্ত ও নিত্যানন্দময় আত্মা। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও। জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও। অনাদি বেদ এইরূপে ঘোষণা করিতেছেন যে, এই সৃষ্টি-ব্যাপার কতকগুলি নির্দ্দয় ও নির্ম্মম নিয়মাবলির প্রবাহস্বরূপ নয় বা অনন্ত কার্য্যকারণের বন্ধন নয়। এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মের আদিতে, প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে এমন এক মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন, যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, মেঘ-বারি বর্ষণ করিতেছে, ও মৃত্যু জগতীতলে পরিভ্রমণ করিতেছে। এক্ষণে সেই পুরুষের স্বরূপ কি? তিনি সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, সকলের উপরেই তাঁহার পূর্ণ দয়া। "তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পরম বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি অগণন ভুবনের ভার ধারণ করিয়া আছ, হে প্রভো, এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিবার শক্তি আমায় দাও।" বেদবিদ্ ঋষিগণ এইরূপ গান করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কি দিয়া পূজা করিব? প্রীতি দিয়া। তাঁহাকে প্রিয়তমের ন্যায় পূজা করিতে হইবে। ইহ জীবনে ও পর জীবনে আমাদের যাহা কিছু আছে সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই অধিক প্রিয়।

বেদ শুদ্ধ-প্রেম সম্বন্ধে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে দেখা যাউক হিন্দুগণ ভূভারহারী হরির অবতার বলিয়া যাঁহাকে বিশ্বাস করেন সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমকে কিরূপে পূর্ণতায় আনয়ন করিয়াছেন ও তৎসম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন। পদ্মপত্র জলে থাকিলেও তাঁহাতে যেমন জল লাগে না; মনুষ্যও এই সংসারে সেইরূপ, ঈশ্বরে হৃদয় সমর্পণ করিয়া হস্তকর্ম্মে বিনিয়োগ করতঃ নির্লিপ্ত ভাবে থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহ ও পর কালে পুরস্কার প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালবাসা মন্দ নয়, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতে হয় বলিয়া ভালবাসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা উচিত যে "হে ভগবন্, আমি তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা কিছুই চাহি না, যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমি শত শত নরকেও যাইব, কিন্তু হে প্রভো! এই কর, যেন সকল অবস্থাতেই পুরস্কার প্রত্যাশা না করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তোমায়

ভাল বাসিতে পারি।"

তৎসাময়িক ভারতবর্ষের সম্রাট্ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যস্বরূপ ছিলেন। তিনি শত্রু কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাণীর সহিত হিমালয়পাদবর্ত্তী বনপ্রদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন। তথায় রাণী একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নাথ! আপনি এতদূর ধার্ম্মিক যে, লোকে আপনাকে ধর্ম্মরাজ আখ্যা দিয়াছে। আপনি এরূপ হইয়াও কেন এত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "প্রিয়ে! দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়া দেখ; আহা কেমন সুন্দর ও মহান্! আমি উহাকে বড় ভাল বাসি। যদিও পর্ব্বত আমাকে কিছুই উপহার দেয় না, তথাপি সুন্দর ও মহান্ বস্তুকে ভালবাসাই আমার স্বভাব বলিয়া আমি উহাকে অতিশয় ভালবাসি। ঈশ্বরকে আমি ঠিক এই জন্যই ভালবাসি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের কারণ। তিনিই ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহাকে ভালবাসাই আমার স্বভাব, সুতরাং ভালবাসি। আমি তাঁহার নিকট কিছুই চাই না; তাঁহার যথায় ইচ্ছা হয়, তিনি আমায় তথায় রাখুন। সর্ব্ব অবস্থাতেই আমি তাঁহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার বিনিময় চাহি না। আমি ধর্ম্ম বণিক্ নহি।"

বেদ বলেন, আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, কেবলমাত্র পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন। যখন এই বন্ধন হইতে মুক্ত হন, তখনই পূর্ব্ববৎ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অবস্থার নাম মুক্তি অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু, আধি ব্যাধি প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি। ঈশ্বরের কৃপা হইলেই আত্মার দাসত্ব মোচন হয়। পবিত্র-স্বভাব লোকের উপরেই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্তির উপায়; যখন তাঁহার কৃপা হয়, তখন পবিত্র হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন। সেই নির্ম্মল, বিশুদ্ধ মানব ইহজীবনেই তাঁহার দর্শনলাভ করেন। তখন তাঁহার সমুদায় কুটিলতা নাশ পায়, সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হয়; তিনি কর্ম্মফলের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। হিন্দুধর্ম্মের ইহাই লক্ষ্য, ইহাই উদ্দেশ্য। হিন্দুগণ কেবলমাত্র মত বা শাস্ত্রবিচার লইয়া থাকিতে চান না। ইন্দ্রিয়সমুদায়ের অতীত যে অবস্থা, তিনি তাহাতে অবস্থিত হইতে চান। জড়ের সহিত সম্বন্ধরহিত আত্মা যদি থাকেন, যদি দয়াময় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা

থাকেন, তিনি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চান। তাঁহাকে দর্শন না করিলে কখনও সন্দেহ দূর হয় না। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে তৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান্। অতএব "আমি আত্মাকে দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়াছি", ইহাই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণের আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণপ্রয়োগ। এরূপ না হইলে কোনও মনুষ্য পূর্ণ হয়েন না। তাঁহারা কোন একটী মত বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হন না, কিন্তু সেই বিশ্বাস যত দিন না আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়, ততদিন তাঁহারা স্থির থাকেন না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য—দেবতা হইবার জন্য,—ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য লাভ করিয়া তৎসাক্ষাৎকার দ্বারা কৃতার্থ হইবার জন্য ক্রমাগত অধ্যবসায় ও যত্নই হিন্দুধর্ম্মের লক্ষ্য। হিন্দুগণ সর্ব্বলোকপিতা ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করিতে চান। পূর্ণ হইলে মনুষ্য কিরূপ হয়েন? তিনি নিত্যানন্দ ভোগ করেন। যিনি সমুদায় লাভাপেক্ষা পরম লাভস্বরূপ, সেই পরমানন্দধাম ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দের অধিকারী হয়েন। সমগ্র হিন্দুগণই এই বিষয়ে একমত। ভারতবর্ষীয় সমুদায় সম্প্রদায়ই এ বিষয়ে একবাক্য। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তুরীয় বা নির্ব্বিকল্প অবস্থার নাম পূর্ণাবস্থা, এবং যখন সেই নির্ব্বিকল্পাবস্থা একমাত্র, অদ্বিতীয়, তখন তাহা গুণাতীত সুতরাং অব্যক্ত। অতএব যখন কোন আত্মা এই নির্ব্বিকল্পাবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনি ব্রহ্মে লীন হইবেন বা ব্রহ্মই হইবেন। এরূপ আত্মা দ্বৈতজ্ঞানপরিশূন্য হওয়ায় আপনিই সৎস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ হইয়া অমরত্ব লাভ করিবেন। তাঁহার অপর কোনও ধ্যেয় বিষয় থাকিবে না। কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত তাঁহাদের পুস্তকে আত্মার এই নির্ব্বিশেষ অবস্থাকে জড়াবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ইহাতে তাঁহাদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ যিনি কখনও আত্মাতবেদনা উপলব্ধি করেন নাই, তিনিই অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া পরিহাস করেন।

আমি বলিতেছি যে, এই মহোচ্চ অবস্থা জড়াবস্থা নহে। যখন আমি এই একটি ক্ষুদ্র দেহে আত্মজ্ঞান স্থাপন করিয়া সুখ বোধ করিতে পারিতেছি, তখন

যদি আমি দুইটি দেহে এরূপ করিতাম, তাহা হইলে আরও সুখ বোধ করিতে পারিতাম। এইরূপ তিনটি, চারিটি, পাঁচটি, ইত্যাদি দেহসংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইবে, তদনুসারে আমার সুখও তত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে; এবং এইরূপে যখন এই নিখিল বিশ্বেই আমার আত্মবোধ হইবে, তখনই আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইব। অতএব উক্ত বিশ্বদেহ লাভ করিতে গেলে এই সামান্য ক্ষুদ্র দেহ অবশ্যই অতিক্রম করিতে হইবে। যখন আমি প্রাণময় হইয়া যাইব, তখনই মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইব। যখন আনন্দময় হইয়া যাইব, তখনই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব। যখন আমি জ্ঞানময় হইয়া যাইব, তখনই অজ্ঞানের হস্ত অতিক্রম করিব। বিজ্ঞানও অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা যে দেহকে প্রত্যক্ষ ও একভাবাপন্ন বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা বাস্তবিক সেরূপ নয়। ওরূপ বোধ ভ্রম মাত্র কারণ এই নিরবচ্ছিন্ন জড় সমুদ্রে তরঙ্গরাজির ন্যায় উহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই নূতন হইতেছে সুতরাং আমার চৈতন্যাংশ কখনও পরিবর্ত্তনশীল বা ভ্রমাত্মক নয় বলিয়া, সর্ব্বতোভাবে সত্য এবং তজ্জন্যই "আমি একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা" এই অদ্বৈতজ্ঞানই কেবল যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞান এক মূল বস্তু বা শক্তির অন্বেষণেই নিযুক্ত এবং যখনই তাহা আবিষ্কার করিবে, তখনই ইহা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইবে। যেমন রসায়ন শাস্ত্র যদি এমন একটি ভূতপদার্থ আবিষ্কৃত করেন, যাহা হইতে অন্যান্য সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা চরম উন্নতি লাভ করিল। পদার্থবিদ্যা যদি এমন এক শক্তির তত্ত্ব জানিতে পারেন, অন্যান্য শক্তি যাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ হইল। যিনি এই নরলোকে একমাত্র জীবন স্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্ত্তনশীল জগতের একমাত্র অচল, অটল, ভিত্তিমূল, যিনি একমাত্র পরমাত্মা—অন্যান্য আত্মা যাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপ, ধর্ম্মবিজ্ঞান যখন সেই একমাত্র মূল কারণকে দেখিতে পাইয়াছে, তখনই তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এইরূপে বহু ঈশ্বরবাদ দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে, ধর্ম্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না।

বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও চরম এই। সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে সৃষ্টি আখ্যা দিতে চান না। তাঁহারা বলেন যে, জগৎ ক্ষণে ক্ষণে ভিন্নাকার ধারণ করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব রূপ বিকাশ করিতেছে মাত্র। হিন্দু সন্তান চিরকাল এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন এবং বৈজ্ঞানিকগণ অধুনা অধিকতর ওজস্বিভাষায় নানাবিধ প্রমাণাদি দেখাইয়া দৃঢ়ভাবে তাঁহারই মতের পোষকতা করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দেরই সঞ্চার হইতেছে।

এক্ষণে বেদান্তের উচ্চ শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া অজ্ঞানীদের ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করি।

প্রথমেই আমি বলিয়া রাখি যে, ভারতবর্ষে বহু ঈশ্বরবাদ নাই। প্রতি দেবালয়েই যদি কেহ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি শুনিবেন যে, পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, এমন কি, সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি যাবতীয় গুণ সমর্পণ করিতেছেন। ইহাকে বহু ঈশ্বরবাদ বা কোন দেববিশেষের প্রাধান্যবাদ প্রভৃতি কোন বাদই বলে না। গোলাপকে যে কোন নাম দাও না কেন, তাহাতে তাহার গন্ধের কোন হানি হইবে না। কোন একটা নাম দিলেই যে ঠিক বুঝান হইল, তাহা নহে। বাল্যকালে আমি একদা এক খৃষ্টান পাদরিকে কতকগুলি লোকের সম্মুখে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম। নানাবিধ কথার মধ্যে তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, "হে ভ্রান্ত জীবগণ! আমি যদি তোমাদের ঠাকুরকে এই লাঠীর খোঁচা দিই, সে আমার কি করিতে পারে?" জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল, "আমি যদি তোমার ভগবানকে দুর্ব্বাক্য বলি, সে আমার কি করিতে পারে?" পাদরী উত্তর করিলেন, 'মৃত্যুর পর তোমার শাস্তি হইবে।" সেই ব্যক্তি কহিল, "তুমি মরিলে পর আমার দেবতাও তোমার বিধিমত পুরস্কার দিবেন।" ফল দ্বারায় বৃক্ষের গুণাগুণ জানা যায়। যখন আমি দেখি যে, এই সকল বিগ্রহসেবকদিগের মধ্যে এরূপ সৎস্বভাববিশিষ্ট ও জ্ঞানসম্পন্ন লোক আছেন, যাঁহাদের তুল্য লোক আমি কখনও কুত্রাপি দেখি

নাই, তখন এই প্রশ্ন আপনা আপনি মনে উদয় হয়, "পাপ হইতে কখন কি পবিত্রতা জন্মিতে পারে?"

কুসংস্কার মনুষ্যের শত্রু বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণতা সর্ব্বাপেক্ষা হেয়। আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তবে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ "ধর্ম্মালয়" বলিয়া এক স্বতন্ত্র স্থলে কেন তাঁহার আরাধনা করিতে যান? কেন তাঁহারা ক্রুশকে এত পবিত্র বলেন? প্রার্থনার সময় কেন তাঁহারা উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন? ক্যাথলিক্ সম্প্রদায় ভুক্তদিগের ধর্ম্মমন্দিরে এত মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে কেন? প্রার্থনাকালে প্রটেষ্টেণ্ট সম্প্রদায়ীদের হৃদয়ে এত ভাবময়ী মূর্ত্তির বিকাশ হয় কেন? হে ভ্রাতৃগণ, নিশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবন ধারণ করা যেরূপ অসম্ভব, চিন্তাকালে মূর্ত্তিবিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। স্মৃতির উদ্দীপক ভাবপরম্পরানুক্রমে আগে কোনও মূর্ত্তি মনে উদয় হয়, পরে তজ্জনিত ভাবের উদ্ভব হয় অথবা অগ্রে ভাব, পরে মূর্ত্তি মানসোপরি অঙ্কিত হয়। জগতে প্রায় সমগ্র মানবই সর্ব্বব্যাপী শব্দের যথাযথ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে? যদি ইহা স্বীকার না কর, তথাপি "সর্ব্বব্যাপী" শব্দটী আবৃত্তি করিলে আমাদের বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই উদয় হয় না।

অতএব যেমন মানবের স্বভাবই এই যে, তাঁহার অনন্তের ভাবোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত নীলাকাশ বা অপার সমুদ্র আপনা আপন মনে আসিয়া পড়ে এবং যেমন কেহ কেহ সর্ব্বব্যাপিত্বও পবিত্রতার ভাব স্ব স্ব স্বভাবানুসারে গির্জ্জাঘর, মস্‌জিদ, বা ক্রুশের সহিত সম্মিলিত করিয়া রাখেন, সেইরূপ হিন্দুরা পবিত্রতা, নিত্যত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি স্বভাব সকলকে নানারূপ দেববিগ্রহে সম্মিলিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের সহিত ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই প্রভেদ যে, ভিন্ন ধর্ম্মীদের কেহ কেহ সমস্ত জীবনের লক্ষ্য স্বীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উন্নতিসাধনসঙ্কল্পে বদ্ধ রাখিয়া স্ব স্ব উন্নতির পথে কণ্টক দিয়াছেন; কারণ তাঁহাদের ধর্ম্ম কতিপয় মতের পোষকতা করা আর লোকের উপকার করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের লক্ষ্য ঈশ্বর সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মোপলব্ধি। মানব ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা স্বয়ং

ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং দেববিগ্রহই হউক, দেবালয়ই হউক, বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রই হউক, এই সমুদায় তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বাল্যাবস্থার সহকারী মাত্র। এ সকল তাঁহার চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। মনুষ্য ক্রমাগতই উন্নতির পথে আরোহণ করিবেন। তিনি কোথাও স্থির হইয়া থাকিবেন না। "বাহ্যপূজা, মূর্ত্তিপূজা—প্রথমাবস্থার কার্য্য. পরে কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মানসিক প্রার্থনা, কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং চরমাবস্থা।" হিন্দুশাস্ত্র ইহাই প্রকাশ করিতেছেন। যে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি কিছুকাল পূর্ব্বে করযোড়ে জানু পাতিয়া দেববিগ্রহের সম্মুখে পূজার্থ বসিয়া থাকিতেন, শুন, ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভের পর তিনি কি বলিতেছেন, "সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না. চন্দ্র, তারা আর এই সমুদায় বিদ্যুৎও তাঁহার প্রকাশক নহেন, সুতরাং অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবেন? ইঁহারা সকলেই তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েন।" এক্ষণে তাঁহার বাহ্যপূজা ত্যাগ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভিন্নধর্ম্মীদের ন্যায় বিগ্রহ-সেবাকে তিনি পাপজনক বলিয়া ঘৃণা করেন না। জীবনের প্রথমাবস্থায় তাঁহার পক্ষে ইহা আবশ্যকীয়। বাল্য যৌবনাদির জন্মদাতা। বৃদ্ধ যদি বাল্য ও যৌবনাবস্থাকে পাপের অবস্থা বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহা হইলে কি তিনি হাস্যাস্পদ হইবেন না? আবার হিন্দুধর্ম্মে বিগ্রহসেবা যে সকলের পক্ষেই বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে।

কিন্তু যদি কেহ বিগ্রহসাহায্যে সহজে আপনার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে কি তাহা তাঁহার পক্ষে পাপজনক? পরে তাঁহার উচ্চাবস্থা হইলে তিনি কি পূর্ব্বাবস্থাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন? হিন্দু বলেন যে, মানব ভ্রম হইতে সত্যে গমন করিতেছেন না, কিন্তু সত্য হইতে সত্যান্তরে গমন বা নিম্ন হইতে উর্দ্ধে গমন করিতেছেন। হিন্দুর পক্ষে ক্ষুদ্র অজ্ঞানীদের ধর্ম্ম হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্য্যন্ত যাবতীয় ধর্ম্মই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম উপলব্ধির সাধন বা সোপান স্বরূপ; জন্ম ও অবস্থা ভেদে যাঁহার পক্ষে যাহা উপযোগী, তিনি সেইটিকে আশ্রয় করিয়া অপরটিতে উত্থিত হইবেন। অতএব প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল (বাজজাতীয় পক্ষী) সন্তানের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অধিকতর উচ্চে উঠিতে থাকে। এইরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক-

ক্রম বলশালী হইতে হইতে পরিশেষে মহান্ সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হয়।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির নিয়ম। হিন্দুগণ ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ করেন এবং সমাজকে তাহাই মান্য করিতে আদেশ করেন। সমাজ সম্মুখে এক মাপের জামাগুলি রাখিয়া রাম, শ্যাম, হরি প্রভৃতি সকলকেই তাহা পরিধান করিতে অনুমতি করেন। যদি হরি বা শ্যামের দেহে তাহা সম্যক্ না হয়, তবে গাত্র আচ্ছাদনের জন্য তাহাদের আর জামা পরা হইল না। হিন্দুগণ বুঝিয়াছেন যে, সাপেক্ষ জ্ঞানকে আশ্রয় না করিলে নিরপেক্ষ জ্ঞানের ধারণা বা উপলব্ধি হয় না বা বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায় না। অতএব হিন্দুদের দেববিগ্রহ, খ্রীষ্টীয়ানদের ক্রুশ, ও মুসলমানদের চন্দ্রকলা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়-স্বরূপ। তাঁহারা এরূপ বলেন না যে, উক্ত প্রকার আশ্রয় সকলের পক্ষে আবশ্যকীয়, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই যে ইহাতে পরম উপকার লাভ করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব যাঁহাদের উহা আবশ্যক নাই, তাঁহারা অপর দলকে কুকর্ম্ম করিতেছে বলিবেন, ইহা অতীব অন্যায়।

আর এক বিষয় বলা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজা একটা ভয়ানক ব্যাপার নয়। ইহা দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং ইহা দুর্ব্বল অধিকারীদিগকে ধর্ম্মের উচ্চভাব ধারণা করিতে সক্ষম করে। হিন্দুদের অবশ্যই দোষ আছে, কিন্তু এইটি জানা উচিত যে, ইহা তাঁহাদের আত্মদেহপীড়নেই আবদ্ধ, অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের শিরশ্ছেদনে বিস্তৃত নহে। হিন্দুনরনারীর মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মোন্মাদ হইয়া অগ্নিকুণ্ডে স্বীয় দেহপাত করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখন বিধর্ম্মিবিনাশের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করেন না। এবং যদিও ইহাকে তাঁহার দুর্ব্বলতা বল, সে দোষ হিন্দুধর্ম্মের নয়। খৃষ্টীয়ানগণ ডাকিনী বলিয়া কত কত স্ত্রীলোককে পুড়াইয়া মারিয়াছে বলিয়া, তাহা কি খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষ না তাহাদের দোষ?

সুতরাং হিন্দুর পক্ষে সমস্ত ধর্ম্মই নানা রুচিবিশিষ্ট নরনারীর, নানা

অবস্থার মধ্য দিয়া সেই একমাত্র ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য অগ্রসর হওয়ার উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মনুষ্যকে ব্রহ্মে পরিণত করিতে নিযুক্ত এবং সেই এক ঈশ্বরই সকল ধর্মপথ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ধর্মগুলি পরস্পর এত বিরুদ্ধভাবাপন্ন কেন? হিন্দু বলেন, আপাততঃ দৃষ্টিতে ঐরূপ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভিন্নাবস্থাপন্ন ভিন্ন-প্রকৃতিদের জন্য এক সত্য হইতেই সেই সকল বিপরীত মত আসিয়াছে।

এক অলোক, ভিন্ন বর্ণের মধ্য দিয়া আসিতেছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেখাইতেছে। প্রত্যেক স্বভাবের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সকল ভিন্নতার আবশ্যক। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে সেই এক সত্যই রাজত্ব করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ঈশ্বর বলিয়াছেন, "মণিগণ যেমন সূত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সমস্ত ধর্মই সেইরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে।" "যাহা কিছু অতিশয় প্রভাবশালী বা অতিশয় সুন্দর ও পবিত্র, তাহা আমার শক্তিসম্ভূত বলিয়া জানিবে।" এই শিক্ষার ফল কি? আমি সাহস করিয়া বলিতেছি যে, সমুদয় সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে হিন্দুই একমাত্র মুক্তির অধিকারী আর কেহ নহে, এরূপ ভাব কেহ দেখাইতে পারিবেন না। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলিতেছেন যে, "ভিন্নজাতীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যেও আমরা সিদ্ধ পুরুষ দেখিতে পাই।"

আর এক কথা। কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সর্বতোভাবে আস্তিকাবুদ্ধিবিশিষ্ট হিন্দুগণ, দুর্জ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মতে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন? বৌদ্ধ ও জৈনেরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না সত্য, কিন্তু মনুষ্যের ভিতর দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব আনাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। উঁহারা স্বতন্ত্র ভগবান মানুন বা নাই মানুন, আপনাকে দেবতা করাই উঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সকল ধর্মের উদ্দেশ্যও তাহাই। তাঁহারা জগৎপিতা জগদীশ্বরকে দেখেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রস্বরূপ আদর্শ মনুষ্য বুদ্ধদেব বা জিনকে দেখিয়াছেন এবং পুত্রকে দেখিলেই পিতাকে দেখা হইল।

ভ্রাতৃগণ, হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত ভাব এই আমি তোমাদের নিকট বিবৃত

করিলাম। হিন্দুগণ আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া অনেক বিষয়ে হয়তো সফলকাম হয়েন নাই। কিন্তু যদি কখনও এক সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্মের উদ্ভব হয়, তাহা কখনও দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই ধর্ম্ম, যে অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদেশ করিবে, তদ্রূপ অনন্ত হইবে। সেই ধর্ম্মসূর্য্য কৃষ্ণভক্ত বা খ্রীষ্টভক্ত, সাধু বা অসাধু সকলেরই উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে। সেই ধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণের, কেবল বৌদ্ধের, কেবল খ্রীষ্টীয়ানের বা কেবল মুসলমানের সম্পত্তি হইবে না, পরন্তু সকলেরই সম্পত্তিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির অনন্ত পথ মুক্ত থাকিবে। সেই ধর্ম্ম এতদূর সার্ব্বভৌমিক হইবে যে, তাহা অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে; যাহাদের বুদ্ধি পশুতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এরূপ মনুষ্য হইতে—যাঁহারা স্ব স্ব হৃদয় মনের উৎকৃষ্ট গুণরাশি দ্বারা সমস্ত মানবজাতির উপরে স্থান পাইয়াছেন, সমাজ যাঁহাদিগকে সাধারণ মনুষ্য বলিতে সাহস না করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন, সেই সমুদয় নরপুঙ্গবগণ পর্য্যন্ত—সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থানদান করিবে।

অতএব সেই ধর্ম্ম কাহারও উৎপীড়নের কারণ না হইয়া সকলের সহিত সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া চলিবে, প্রত্যেক নরনারীকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে, এবং সমস্ত মনুষ্যজাতিকে স্ব স্ব দেবস্বভাবোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবে।

যদি কেহ এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মদান করেন, সমস্ত জাতিই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবে। অশোকের ধর্ম্মসভা কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য হইয়াছিল। আকবর যদিও সকল ধর্ম্মকে স্থান দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সভা কোনও কার্য্যকারী হয় নাই। "প্রত্যেক ধর্ম্মেই ঈশ্বর আছেন" সমস্ত জগতে ইহা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই ছিল

যিনি হিন্দুদিগের ব্রহ্ম, পারসীকদিগের অহুর মজদ্, বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, মুসলমানদিগের আল্লা, ইহুদিদিগের জিহোবা, খ্রীষ্টীয়ানদিগের স্বর্গস্থ পিতা, তিনি তোমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন। পূর্ব্বগগনে নক্ষত্র উদিত হইল। কখনও উজ্জ্বল, কখনও হীনপ্রভ

হইয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে গমন করিল। ক্রমে সমস্ত জগৎ প্রদক্ষিণ করতঃ সহস্রগুণ উজ্জলভাবে পুনরায় পূর্ব্বগগনে উদিত হইতেছে! স্বাধীনতার মাতৃভূমি দেবি কলম্বিয়ে!* তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ হস্তকে কলঙ্কিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনি সহজে ধনশালিনী হইবার চেষ্টাও পাও নাই। সুতরাং তুমিই সভ্যজগতের পুরোভাগে গমন করিয়া শান্তিপতাকা উড়াইবার অধিকারিণী।

২০শে সেপ্টেম্বর, দশম দিবসের অধিবেশন।

"দরিদ্র পৌত্তলিক"।

খ্রীষ্টীয়ানগণের সর্ব্বদাই সৎসমালোচনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, এবং আমার বোধ হয় যে, যদি আমি তাঁহাদের কোনও ভ্রম প্রমাদ দর্শাইয়া দিই, তাঁহারা তাহাতে কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। হে খৃষ্টীয়ানগণ! তোমরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের নিকট ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতে ব্যস্ত, কিন্তু বল দেখি, অনাহারের হস্ত হইতে তাহাদের দেহ উদ্ধারের জন্য কোন রূপ যত্ন কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র হিন্দু নর নারী ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু হে খৃষ্টীয়ানগণ! তোমরা তদ্বিষয়ে কোনই মনোযোগ কর না। তোমরা সমুদয় ভারতবর্ষে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু ভারতবাসীদের ধর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহারা শুষ্ক কণ্ঠে কেবল মাত্র অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত্ত লোকদিগকে ধর্ম্মের কথা বলা, বা তাহাদিগকে দর্শন শাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতবর্ষে যদি কোন ধর্ম্মপ্রচারক পারিশ্রমিক লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিচ্যুত ও সর্ব্বতোভাবে ঘৃণিত হইতে হয়। আমি আমার গ্রাসাচ্ছাদনহীন স্বদেশীয়গণের জন্য তোমাদের নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি, কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান্ রাজ্যে খ্রীষ্টীয়ানমণ্ডলীর নিকট পৌত্তলিকদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা বিশেষ রূপে

* কলম্বস্ দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া আমেরিকার আর একটি নাম কলম্বিয়া।

উপলব্ধি করিতেছি। [ইহার পর সনাতন ধর্ম্মের পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তিনি বক্তৃতা শেষ করিলেন।]

[২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দ্বাদশ দিবসের অধিবেশনে হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ই অধিক বলা হইয়াছিল। সে দিবস বিবেকানন্দ স্বামী সনাতনধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বলিয়াছিলেন। নানামতাবলম্বী নরনারীগণ তাঁহাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে শত শত ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি তখনই অতি নিপুণতার সহিত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি সে দিবস তাঁহাদের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে এতদুর কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর এক দিবস অন্যত্র বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন, তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হয়েন।]

২৬শে সেপ্টেম্বর, ষোড়শ দিবসের অধিবেশন।

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ।

সভাপতি মহাশয়, ভ্রাতৃমণ্ডলী ও উৎসাহদাতৃগণ, আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নহি, কিন্তু আমি বৌদ্ধ, ইহা বলিলেও দোষ হয় না। যদিও চীন, জাপান, ও সিংহল দেশ সেই লোকগুরু বুদ্ধের উপদেশানুসারে কার্য্য করেন, তথাপি সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করেন। আপনারা ইতিপূর্ব্বে শুনিলেন যে, আমি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু তাহার অর্থ দোষদর্শান নহে। যাঁহাকে আমি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করি, তাঁহার দোষ দর্শান আমার অভিপ্রায়ই নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। ইহুদীধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমানকালের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। যীশুখ্রীষ্ট ইহুদীজাতীয় ও শাক্য মুনি হিন্দুজাতীয় ছিলেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, ইহুদীগণ যীশুকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এমন কি, ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন, হিন্দুগণ শাক্যমুনিকে ঈশ্বরের ন্যায় উচ্চাসন

দিয়া এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বুদ্ধদেবের যথার্থ শিক্ষার যে পার্থক্য, তাহা আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে প্রধানতঃ এই বোধ হয় যে, শাক্যমুনি কোন নূতন মত প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর ন্যায় তিনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই। যীশু ইহুদীকে নূতন ধর্ম্ম-পুস্তকে বিশ্বাস করিতে ও খ্রীষ্টিয়ানকে পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তক হইতেও শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া উভয়কে বিপরীতভাবে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এবং একদিকে ইহুদীগণ যেমন নূতন ধর্ম্ম-পুস্তকে প্রাচীন ধর্ম্ম-পুস্তকের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, অপরদিকে সেইরূপ বৌদ্ধগণও বুদ্ধের ভিতর হিন্দুধর্ম্মের সত্যসমূহেরই যে পরিপাক হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নহে। তিনি আপনার জীবনে হিন্দুধর্ম্মের চরম সিদ্ধান্ত গুলিকে পূর্ণরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিয়া থাকেন—জ্ঞানকাণ্ডে জাতিভেদ নাই। অতি উচ্চবর্ণের লোকের সন্ন্যাসে যেরূপ অধিকার, অতি হীনবর্ণের লোকেরও সেইরূপ অধিকার—সন্ন্যাস লইলে উভয়েই সমান। যথার্থ ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই; জাতিভেদ কেবল সামাজিক অবস্থানুসারে হইয়া থাকে। শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন এবং বেদে যে সমুদায় সত্য সুগুপ্ত ছিল, তাঁহার উদারহৃদয় সেই সমুদায় সত্যকে পৃথিবীর যাবতীয় জনসাধারণের গোচর করিয়া দিয়াছিল। জগতে কার্য্যতঃ ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে তিনিই সকলের আদি গুরু, তিনিই প্রথমে অন্য ধর্ম্ম হইতে স্বীয় ধর্ম্মে বহুলোক আনয়ন করিয়া লোকদিগকে ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে আনিবার পথ দেখাইয়াছেন।

দরিদ্র ও মূর্খদের উপর তাঁহার অধিক দয়া ছিল বলিয়া, সেই লোকগুরু বুদ্ধের গৌরব আরও অধিক হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য ছিল। যে সময় বুদ্ধ স্বীয়মত প্রচার করিতেন, সে সময় সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষে কথিত হইত না। ইহা সে সময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার উপদেশ সকলকে সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ

করিতে চাহিলে, তিনি স্থির ভাবে বলিতেন, "আমি দরিদ্রের জন্য ও জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি। আমি চলিত ভাষায় উপদেশ দিব।" এবং আজ পর্য্যন্তও তাঁহার অধিকাংশ উপদেশাবলি সেই সময়কার চলিত ভাষায় লিখিত।

দর্শনশাস্ত্র যত উচ্চ আসন গ্রহণ করুন ও যাহাই বলুন না কেন, যত দিন জগতে মৃত্যু বলিয়া কোন ব্যাপার থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে দুর্ব্বলতা বলিয়া কোন এক ভাব থাকিবে, যত দিন মানব স্বীয় দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি পরিত্যাগ করিবেন, ততদিন ঈশ্বরেও বিশ্বাস থাকিবে। দর্শন শাস্ত্রের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, সেই লোকগুরু বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদরূপ সনাতন অচলের উপর বজ্রবেগে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অপর দিক দিয়া দেখিলে, সমুদায় নরনারী যে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাদরে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই সনাতন পুরুষকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপহরণ করিলেন। এই অত্যাচারে ভারতবর্ষে উক্তধর্ম্মের মৃত্যুই স্বাভাবিক হইয়াছিল, এবং আজ পর্য্যন্তও সেই বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমিতে এমন একটিও পুরুষ বা স্ত্রী নাই, যিনি আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন।

আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, হিন্দুধর্ম্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। সেই সমাজসংস্কারের জন্য আগ্রহ, প্রত্যেকের জন্য সহানুভূতি ও দয়া, প্রায় একবারে লোপ পাইল। বৌদ্ধধর্ম্ম সেই সহানুভূতি ও দয়া সাধারণের ভিতর প্রবাহিত করিয়া তাহাদের হৃদয়কে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহা সেই সময় ভারতবর্ষীয় সমাজকে এত দূর উন্নত ও মহান্ করিয়াছিল যে, কোন গ্রীকদেশীয় পুরাতত্ত্বলেখক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিবার সময় বলিয়াছেন যে, কোনও হিন্দু মিথ্যা কহেন না এবং কোনও হিন্দুরমণী অসতী নহেন।

[সভামঞ্চে যে সমুদায় বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন।]

হে বৌদ্ধগণ, তোমাদের পরিত্যাগ করিয়া আমরা উন্নত হইতে পারি না, এবং আমাদের ছাড়িয়া তোমরাও উন্নত হইতে পার না। অতএব নিশ্চয় জানিও যে, আমাদের পরস্পরের অসম্মিলন ইহাই স্পষ্ট দেখাইয়া

দিতেছে যে, তোমরা ব্রাহ্মণগণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া দৃঢ়তা লাভ করিতে পার না, এবং আমরাও তোমাদের ন্যায় উচ্চহৃদয় না পাইলে, উন্নত হইতে পারি না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এই হেতুই আজ ভারতবর্ষ ত্রিংশৎ কোটি ভিক্ষুকের আবাসভূমি হইয়াছে, এবং সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজাতীয় জেতৃগণের দাসত্ব করিতেছে। অতএব আইস, আমরা ব্রাহ্মণের ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের উচ্চহৃদয়, মহান্ আত্মা, এবং অসাধারণ লোকহিতকারিতা শক্তির সম্মিলন করিয়া দিই।

২৭শে সেপ্টেম্বর, সপ্তদশ (শেষ) দিবসের অধিবেশন।

বিদায়।

জগতে সর্ব্বধর্ম্মমহাসমিতির সম্ভবপরতা আজ সর্ব্বতোভাবে সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। এবং যাঁহারা এই মহাসভা গঠনের জন্য সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছেন ও তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমকে শুভময় ফল দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।

যাঁহাদের প্রশস্ত হৃদয় এবং সত্যানুরাগ এই স্বপ্নের ন্যায় আশ্চর্য্য কাণ্ডকে প্রথমতঃ কল্পনা করিয়া পরে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে, আমি সেই মহানুভবগণকে ধন্যবাদ দিই। এই সভামঞ্চ যে সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবসমূহের বর্ষণ দ্বারা পরিপ্লুত হইয়াছে, আমি সেই সকল উদারভাবকে ধন্যবাদ দিই। যে সমুদায় জ্ঞানালোকসমুজ্জ্বল ভ্রাতৃমণ্ডলি আমার প্রতি সমভাবে দয়া প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন ও যে যুক্তিগুলি দ্বারা ধর্ম্মসমূহের পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যায়, যাঁহারা সেই সকল যুক্তি ও উপায় সবিশেষ উপলব্ধি করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই। এই সুবিন্যস্ত স্বরশ্রেণীর ন্যায় শৃঙ্খলার মধ্যে সময়ে সময়ে কিছু বিশৃঙ্খল ভাব দেখা গিয়াছে। যাঁহারা সেইরূপ বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ-

দিই, কারণ, তাঁহারা ক্ষণিক বিশৃঙ্খলাদ্বারা এখানকার স্বাভাবিক শৃঙ্খলাকে অধিকতর মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

ধর্ম্মসমন্বয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আমি এক্ষণে তদ্বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি না। কিন্তু যদি এখানে কেহ এরূপ আশা করেন যে, উক্ত সমন্বয় এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বারা সংসাধিত হইবে, তাঁহাকে আমি বলি "ভ্রাতঃ! তোমার আশা ফলবতী হওয়া অসম্ভব।" আমি কি ইচ্ছা করি যে, খৃষ্টীয়ান্ হিন্দু হউন? ঈশ্বর তাহা না করুন। আমার কি ইচ্ছা যে, কোন হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টিয়ান্ হউন? ঈশ্বর তাহা প্রতিষেধ করুন। বীজ ভূমিতে রোপিত হইল। মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। সেই বীজটী কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইতে থাকে? না। সেই বীজ হইতে ক্ষুদ্র বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, ইহা ক্রমে আপনার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং মৃত্তিকা, বায়ু ও জলকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া সেই সকল উপাদান দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিবর্দ্ধিত করিয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ। খৃষ্টীয়ানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না, কিম্বা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টীয়ান হইতে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মই অন্যান্য ধর্ম্মগুলিকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্টিলাভ করতঃ আপনার বিশেষত্ব রক্ষা পূর্ব্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্দ্ধিত হইবে।

যদি এই সর্ব্বধর্ম্মমহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকেন, তো তাহা এই। এই সভা ইহা সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মের সম্পত্তি নয়, এবং প্রত্যেক ধর্ম্মই অতি মহানুভব উদারচরিত্র নরনারী প্রসব করিয়াছেন।

এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ কল্পনা করেন যে, অন্যান্য ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া তাঁহার ধর্ম্মই সে সকলকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিবে, তিনি বাস্তবিকই কৃপাপাত্র, তাঁহার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত, তাঁহাকে আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, তাঁহার ন্যায় লোকেরা বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে

প্রতি ধর্ম্মের পতাকার উপর ইহাই লেখা থাকিবে যে, "বিবাদ করিওনা" "পরস্পর সহায়তা কর", "পরস্পরকে বিনাশ না করিয়া মিলিত হইয়া কার্য্য কর", "কলহ ছাড়িয়া মৈত্রী ও শান্তি আশ্রয় কর।"

পরিশিষ্ট ।

১। কার্ডিন্যাল (পৃঃ ১, পং ১)।--খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রধান দুইভাগে বিভক্ত—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান গুরুর নাম পোপ। সমগ্র ক্যাথলিক ধর্ম্মজগৎ ইঁহারই উপদেশানুসারে কার্য্য করেন। এই পোপের অধীনে ৭০ জন কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেককেই কার্ডিন্যাল কহে।

২। আপ্তবাক্য (পৃঃ ৬, পং ১৮১)।—যাঁহারা রাগদ্বেষাদি দ্বারা অভিভূত নহেন, তাঁহাদের কথিত সত্যসমূহের নাম আপ্তবাক্য।

৩। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে...(পৃঃ ৯, পং ১১)।—যোগ্য বস্তু যোগ্যের সহিতই যুক্ত হয়।

৪। এই নিয়মানুসারে তদুপযোগী দেহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন... (পৃঃ ৯, পং ১১, ১২)।—

সঙ্কল্পসংস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম ।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি ।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ৫ অঃ। ১১, ১২।

অর্থ।—ইচ্ছা হইতে ইন্দ্রিয়ব্যাপারের উৎপত্তি ও তাহা হইতে দর্শন শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎপরে মোহ জন্মিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের অবতারণা করে। অন্নপানাদি দ্বারা দেহ যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেহী সেই সেই কর্ম্মানুযায়ী দেব, তির্য্যক্ বা মনুষ্যযোনিতে স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবদেহ প্রাপ্ত হয়েন।

নিজ নিজ গুণানুসারে দেহী স্থূলসূক্ষ্ম প্রভৃতি নানাবিধ দেহধারণ করেন। পরে স্ব স্ব কর্ম্ম ও গুণানুসারে তাঁহাদের অন্য দেহপ্রাপ্তিও দেখা যায়।

৫। পূর্ব্বজন্মের কথা মনে করিতে পারিবে ইত্যাদি ... ... (পৃঃ ১০, পং ৩)।—

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ।

পাতঞ্জল দর্শন।

যখন কোনও বস্তু পরিগ্রহের অর্থাৎ গ্রহণের ইচ্ছা থাকে না, অর্থাৎ যখন তাঁহার কোন বাসনা থাকে না, তখন তাঁহার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের জ্ঞান হয়।

৬। সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না ইত্যাদি··· ··· (পৃং ১০, পং ৫)।—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

গীতা, ২।২৩।

৭। হে বিশ্বপুরবাসী অমৃতের অধিকারিগণ ইত্যাদি (পৃঃ ১১, পং ১৭ হইতে ২১)।—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

* * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ২।৫ ও ৩।৮।

৮। হিন্দুগণ তোমাদের পাপী বলিতে অস্বীকার করেন ... ... (পৃং ১১, পং ২৪)।—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

প্রাতঃস্মরণীয়শ্লোকমেকং।

৯। যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ইত্যাদি ... ... (পৃঃ ১২, পং ৭)।—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কঠ, ৬।৩।

১০। হে ভগবন্, তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা কিছুই চাহি না ইত্যাদি ... ... (পৃঃ ১২, পং ২৫)।—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতা বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

১১। আমি ধর্ম্মবণিক নহি ... (পৃঃ ১৩, পং ১৫)।—

নাহং কর্ম্মফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত॥

* * * *

ধর্ম্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্ম্মবাদিনাম্॥

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩১।২,৫।

১২। তখন তাঁহার সমুদায় কুটিলতা নাশ পায় ইত্যাদি ... ... (পৃঃ ১৩, পং ২২ হইতে ২৪)।—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥—

মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮ এবং শ্রীমদ্ভাগবত, ১।২।২১।

১৩। ব্রহ্মে লীন হইবেন বা ব্রহ্মই হইবেন ... ... (পৃঃ ১৪, পং ১৯)।—

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৯।

১৪। যখন এই নিখিল বিশ্বেই আমার আত্মবোধ হইবে ইত্যাদি ... ... (পৃঃ ১৫, পং ৪)।—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

ঈশোপনিষৎ, ৭।

১৫। বাহ্যপূজা, মূর্ত্তিপূজা প্রথমাবস্থার কার্য্য ইত্যাদি ... ... (পৃঃ ১৮, পং ৪)।—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমাঃ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস। ১২।

১৬। সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না ইত্যাদি ... ... (পৃঃ ১৮, পং ৯)।—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

কঠ, ৫।১৫।

১৭। মণিগণ যেমন সূত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে ইত্যাদি ... ... (পৃঃ ২০, পং ১০)।—

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব

গীতা, ৭।৭।

১৮। যাহা কিছু অতিশয় প্রভাবশালী ইত্যাদি ... ... (পৃঃ ২০, পং ১২)।—

যদ্‌যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

গীতা, ১০। ৪১।

১৯। ভিন্নজাতীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই ... ... (পৃঃ ২০, পং ১৬)

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।

বেদান্তসূত্র, ৩। ৪। ৩৬।